মুক্তিযুদ্ধের অজানা তথ্য
জহির রায়হান এবং সারা যাকের’এর ভাই!

নাজমুল আহসান শেখ

আশুগঞ্জের এক সুবেদার এবং ২য় বেঙ্গলঃ “আচ্ছা খালিল তু বাতা, আমাদের সুবেদার আইয়ুবের (পাঞ্জাবি) পরিবারকে হত্যা করেছে কে? আমাদের জওয়ানরা?” ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের পুরনো দিনের অধিনায়ক, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার ইসহাক, অবিশ্বাস ভরা কণ্ঠে এই প্রশ্ন করেছিলেন পাকিস্তানে বন্দী তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমান (পরবর্তীকালে মেজর জেনারেল এবং বি ডি আর প্রধান)’কে।

আমার মনে হল, আমি যেন কোথায় এই সম্পর্কে কিছু একটা পড়েছিলাম! আমার সংগ্রহে মুক্তিযুদ্ধের উপর বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রায় সব বই, ভারত, পাকিস্তান ও অনান্য দেশ থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ বই আছে। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পাকিস্তানিদের বক্তব্য জানার অভিপ্রায়ে, আমি ‘পাকিস্তান ডিফেন্স জার্নাল’ এর’ও নিয়মিত পাঠক। এই ‘পাকিস্তান ডিফেন্স জার্নাল’এই আমি পেয়েছিলাম পাকিস্তানি কমান্ডো বাহিনীর মেজর এর বর্ননায়, ২৫শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের বিবরন!

আমর বহুবছরের অভ্যাস, মুক্তিযুদ্ধ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, সবসময় ‘ক্রস চেক’ করা। যেমন ধরা যাক, ২৫-২৭ শে মার্চ এর জয়দেবপুরের ঘটনা জানার জন্য ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ততকালীন সব অফিসারদের লেখা বই ও বর্ননা মিলিয়ে ‘ক্রস চেক’ করা। কোন বইয়ে নতুন কোন তথ্য পেলে তা, ‘হাইলাইট’ করা এবং ছোট্ট নোট রাখা।

বই ঘাটতে ঘাটতে হটাৎ চোখে পড়ল, **‘মুক্তিযুদ্ধ এবং আশুগঞ্জ’** নামে ব্যাপক জনসাধারনের কাছে অজানা একটি বই। বইটির প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে সম্পাদনা, সবকিছুই অনাকর্ষনীয়। তাই আমি প্রথমবার শুধু চোখ বুলিয়ে গিয়েছিলাম। আবারও ‘মুক্তিযুদ্ধ এবং আশুগঞ্জ’ নিয়ে বসলাম। বইটিতে ৭১ সালে আশুগঞ্জ এলাকায় সংঘটিত সব যুদ্ধের সাথে জড়িত মুক্তিযোদ্ধাদের এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আশুগঞ্জ এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধের বর্ননা, সংগ্রহ অপরিবর্তিত অবস্থায় সঙ্কলিত করা হয়েছে!

পড়তে পড়তে বইয়ের ২২৬-২৩৩ পৃষ্ঠায় পেলাম, সুবেদার মোখলেছুর রহমান (অব)’ এর বর্ননা আর সেই সংগে অনেক গুরুত্বপূর্ন তথ্য। তিনি ২৭শে মার্চ এর বর্ননা করেছেন ঠিক এইভাবে, “ পথিমধ্যে ল্যান্স নায়েক মজিবুর রহমানের সাথে দেখা হয়। আমরা দুজন পাক সুবেদার আইয়ুব খানের বাসায় গিয়ে তাকে না পেয়ে তার পরিবারের সবাইকে গুলি করে হত্যা করি”। কি সরল বর্ননা (যা কিনা যুদ্ধাপরাধের সামিল)!!

জহির রায়হানঃ একইভাবে ৩০ শে মার্চ ১৯৭২, মিরপুরে জহির রায়হান’এর নিখোজ হওয়া সম্পর্কে মেজর জেনারেল মুহাম্মদ ইব্রাহীম (অবঃ) এর বক্তব্যের সাথে সুবেদার মোখলেছুর রহমান (অব)’ এর বিস্তারিত বর্ননা মিলিয়ে আমরা জহির রায়হানএর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে সত্য উদঘাটন করতে পারি, কারন এই নিয়ে অনেক অপপ্রচার হয়েছে। পরবর্তী সময়ে অনেকে বলেছিলেন যে, জহির রায়হান’কে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলা হয়েছে। জেনারেল মুহাম্মদ ইব্রাহীম (অবঃ) এর বক্তব্য অনূযায়ী, “জহির রায়হান সেখানে গিয়েছিলেন তার ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের সন্ধানে, সেনাসদস্যদের সহগামী হয়ে। মিরপুরে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানী সৈন্য ও বিহারীদের আক্রমনে এইদিন শুধু জহির রায়হান’ নয়, লেঃ সেলিম, নায়েব সুবেদার আবদুল মুমিন সহ ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৪০ জন সৈন্য নিহত হন এবং

তাদের দেহাবশেষ কোন দিনই খুঁজে পাওয়া যায় নাই”। সেই দিন যে কয়জন মিরপুর থেকে প্রান নিয়ে বের হয়ে আসতে পারেন তাদের মধ্যে মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ খান (অব) ও সুবেদার মোখলেছুর রহমান(অব) অন্যতম।

সদ্যপ্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ) বীরবিক্রম ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি সকালবেলায় লে সেলিমকে নিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ১২নং সেক্টরে যান। লে সেলিম, হেলাল মোর্শেদের সঙ্গে থেকে যান এবং মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম চৌধুরী (অবঃ) বীরবিক্রম, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ফিরে আসেন।

সেই কয়েকদিনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরন তিনি লিখেছেন, ‘এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক’ নামক গ্রন্থে (পৃ ২৬-৩৪)। তিনি লিখেছেন, “সেদিন বিহারিদের আক্রমনের মুখে বেঁচে যাওয়া সেনাসদস্যদের কাছ থেকে ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনি। বিশেষ করে ডি কম্পানির অধিনায়ক হেলাল মোর্শেদ ও প্লাটুন কমান্ডার হাবিলদার ওয়াজেদ আলি মিয়া বারকী ঘটনার বিস্তারিত জানান”। তিনি আরো লিখেছেন, “ওই সময় আমাদের সৈন্যদের কোন মৃতদেহ দেখতে পাইনি। পরিস্থিতির কারনে তাৎক্ষনিকভাবে ভেতরের দিকে খোঁজাখুঁজি করা সম্ভব হয়নি। নিহতদের মধ্যে লে সেলিমসহ মাত্র কয়েকজনের মৃতদেহ দিন দুয়েক পর পাওয়া যায়। পুরো এলাকা জনশূন্য করার পরও বাকিদের মৃতদেহ পাওয়া যায় নি। ৩০ জানুয়ারি রাতেই সম্ভবত বিহারিরা সেগুলো সরিয়ে ফেলে”।

জহির রায়হান প্রসংগে তিনি লিখেছেনঃ “এদিকে ৩১ জানুয়ারি থেকে পত্রপত্রিকায় সাংবাদিক ও চলচিত্র পরিচালক জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়ার খবর বের হতে থাকে।। কিছু লোক, সম্ভবত তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব, মিরপুরে এসে তার সম্পর্কে খোঁজ়খবর নেওয়ার চেষ্টা করেন*। এরই মধ্যে একদিন একজন পুলিশ কর্মকর্তা, যার নাম আজ মনে নেই, সেনানিবাসে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি সৈন্যদের সাথে কথা বলার জন্য আমার অনুমতি চান। আলাপে তিনি আমাকে জানান, ‘আপনাদের সংগে কথাবার্তা বলে এবং আমার তদন্তে মনে হচ্ছে জহির রায়হান সৈন্য ও পুলিশের সংগে গুলিবিনিময়ের সময় বিহারিদের গুলিতেই নিহত হয়েছেন’।

অবশ্য এর আগেই আমরা যখন নিজেদের সদস্যদের হতাহতের খোঁজ়খবর তথা প্রাথমিক তদন্ত শুরু করি, তখনই সৈন্যদের সংগে একজন বাঙ্গালি বেসামরিক লোক নিহত হয় বলে তথ্য বেরিয়ে আসে। ঘটনা বিশ্লেষনে বোঝা যায় তিনিই ছিলেন জহির রায়হান। জহির রায়হানের মিরপুরে যাওয়া নিয়ে অনেক ধরনের কথা প্রচলিত আছে। তবে এটা সত্যি যে, তিনি তার ভাই শহীদুল্লাহ কায়সারের খোঁজেই মিরপুর যান।

প্রথমিক তদন্তের সময় সাড়ে ১১নং সেকশনে মোতায়ন সৈন্যদের কয়েকজন জানান, সকাল সাড়ে ৯টা/১০টার দিকে তারা হালকা পাতলা গড়নের একজন বেসামরিক লোককে সাড়ে ১১ ও ১২নং সেকশনের মাঝামাঝি রাস্তায় একা হাঁটতে দেখেন। এ ছাড়া জহির রায়হানের ছবি দেখার পর সৈন্যদের কয়েকজন ওই রকম একজনকে দেখেন বলেও জ়ানান। ১১ টার দিকে বিহারিরা সৈন্যদের উপর আক্রমন করে। অতর্কিত এই আক্রমনে সৈন্যদের সঙ্গে তিনিও নিহত হন। তবে ঠিক কোন জায়গায় তিনি নিহত হন তা সঠিক কেউ বলতে পারেনি। ৪২ জন সেনাসদস্যদের মধ্যে তিন-চারজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। জহির রায়হানসহ বাকি কারোই মৃতদেহ পাওয়া যায়নি”।

আগ্রাবাদের হোটেলের সেই অবাঙ্গালী! ১৯৭৭ সালে, নটরডেম এর বন্ধু নাদিমের কাছেই আমি প্রথম দেখি সেই স্বাধীনতার উপর সেই বিখ্যাত বই, 'A TALE OF MILLIONS' (পরবর্তীতে এই বই 'লক্ষ প্রানের বিনিময়ে' নামে বাংলায় প্রকাশ পায়)। সেই বইতেই নাদিম আমাকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে ওর বাবা, শহীদ কর্নেল কাদির'এর সংশ্লিষ্টতার প্রসংগে মেজর রফিকের বর্ননা দেখায়। 'A TALE OF MILLIONS' বইটিকে নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নিরপেক্ষ দলিল বলে আখায়িত করা যায় কারন এই বইটি প্রকাশের সময় কাল হল ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্টের পূর্বে। সেই সময় মুক্তিযুদ্ধের সাথে সরাসরি জড়িত সবাই জীবিত ছিলেন এবং কেউ কোনদিন এর কোন তথ্যের প্রতিবাদ করেন নাই।

মেজর রফিক, বীর উত্তম এর লেখা 'A TALE OF MILLIONS' বইয়েই আমি প্রথম জানতে পারি ২৫ শে মার্চ রাতে ও পরবর্তী কয়েকদিন, চট্টগ্রামের এক অবাংগালী ব্যাক্তির রহস্যময় (!) কর্মকান্ডের কথা! আরো জানতে পারি, কয়েকদিন পরে এই অবাংগালী ব্যাক্তি'কে কাপ্তাই এর কাছে ৮ম বেঙ্গলের সৈন্যরা গুলি করে মেরে ফেলে!! নাম না জানা এই অবাঙ্গালী ভদ্রলোক, সেই সময় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ হোটেলে অবস্থান করছিলেন। ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় গনহত্যা শুরু হলে, আগ্রাবাদ হোটেলের একাউন্ট্যান্ট'কে সাথে নিয়ে তিনিই প্রথম চট্টগ্রাম রেডিও অফিসে যান। খুব কম মানুষই জানেন যে, নাম না জানা, এই অবাঙ্গালী ভদ্রলোক'ই চট্টগ্রাম রেডিও থেকে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষে সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে এস, ও, এস পাঠান এবং আমাদেরকে সাহায্যের জন্য বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানান!

যেহেতু ঘোষনাটি ইংরেজীতে ছিল এবং সেই সাথে সম্পূর্ন অপরিচিত ব্যাক্তি কর্তৃক এই ঘোষনা প্রচার হওয়ার কারনে, এই বেতার ঘোষনা ও মাহমুদ হোসেনের নাম দেশে এবং বিদেশে তেমন প্রচার পায় নাই। একইসাথে বিদেশী এবং সম্পূর্ন অপরিচিত মাহমুদ হোসেন এবং তার পূর্ব-পরিচিত একমাত্র বাঙ্গালী, আগ্রাবাদ হোটেলের একাউন্ট্যান্ট দুজনেই মার্চ মাসে সমসাময়িক সময়ে নিহত হবার ফলে এই রহস্য বা মাহমুদ হোসেনের পরিচয় আর উন্মোচিত হয় নাই! পরবর্তী নয়মাসের মুক্তিযুদ্ধের কারনেও এই ঘটনাটি সম্পূর্ন চাপা পড়ে যায়।

অনেক বছর পরে, ১৯৯৫-৯৬ সালে উত্তরার রাজলক্ষী মার্কেট'এর বইয়ের দোকান থেকে কৌতুহলবশত আমি জনৈক মানিক চৌধুরীর লেখা "অন্তর্ঘাত ৭১" নামে একটি বই কিনি। পরে দেখি "অন্তর্ঘাত ৭১", নামে নীল মলাটের এই বইটি'তে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের চট্টগ্রামের সব ঘটনার 'টাইমলাইন' অনুযায়ী বিস্তারিত বর্ননা দেওয়া আছে! সেই সময়ের চট্টগ্রামের ঘটনার উপর প্রকাশিত সকল বইয়ের রেফারেন্স অবিকৃত অবস্থায় নিখুতভাবে লিপিবদ্ধ আছে এই বইটিতে। এই বইটিতে আরো আছে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাহমুদ হোসেন'এর ভূমিকার বিশদ বর্ননা। যেমন তিনি মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্র সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছিলেন! বলেছিলেন ভারতের উচ্চপর্যায়ে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে! কিন্তু মাহমুদ হোসেনের পরিচয় সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই "অন্তর্ঘাত ৭১" এ।

১৯৯৬ সাল, আমির কম্পলেক্স, ৩ নম্বর সেক্টর, উত্তরা। আমির কম্পলেক্স এর মালিক, ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক সাহেব খুবই বিনয়ী এবং ভদ্রলোক। তিনি একদিন তার লেখা একটি বই আমাকে উপহার দিলেন (আমি খুবই লজ্জিত, কারন বইটির নাম আমি এই মূহুর্তে মনে করতে পারছিনা কারন বইটি আমার ঢাকার বইয়ের সংগ্রহে আছে)। ফজলুল হক সাহেব বইটির এক জায়গায় লিখেছেন মাহমুদ হোসেনের কথা! "ব্রিটিশ ভারতীয় এই অবাঙ্গালী ভদ্রলোক, মাহমুদ হোসেন ছিলেন ভারতের সাবেক

প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এর ভাগ্নী'র স্বামী। ব্যাবসায়িক কারনে ৭১ এর মার্চ মাসে লন্ডন থেকে চট্টগ্রামে এসেছিলেন"। ফজলুল হক সাহেব খুবই আক্ষেপের সাথে লিখেছেন যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতার ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল এই মাহমুদ হোসেন কি করে একে বারে উধাও হয়ে গেলেন! তার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না! কেউ কি তাকে দেখে নাই?

আমি পরদিনই 'লক্ষ প্রানের বিনিময়ে' ও "অন্তর্ঘাত ৭১" বই দুইটি কিনে জনাব ফজলুল হক সাহেবকে উপহার দেই এবং জানাই যে এই দুইটি বইয়ে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাহমুদ হোসেন'এর ভূমিকার বিশদ বর্ননা দেওয়া আছে। এভাবেই জনাব ফজলুল হক সাহেব দেরীতে হলেও তার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান। আর একইসাথে আমি জনাব ফজলুল হক সাহেবকে কষ্ট করে তার বইটি লেখার জন্য এবং বইয়ে অনেক অজানা তথ্য (মাহমুদ হোসেন'এর পরিচয় এবং লন্ডনে থাকাকালীন মওদুদ আহমেদ'এর কর্মকান্ড সম্পর্কে) প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

দেশের একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট যার নামেঃ বন্ধু নাদিমের বাবা, শহীদ কর্নেল কাদির ১৯৭১ সালে তেল ও গ্যাস উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় না/পাক বাহিনী কর্তৃক অপহৃতত হন এবং অনেকের মতই উনিও চিরদিনের জন্য হারিয়ে যান! মুক্তিযুদ্ধের অমর দলিল 'A TALE OF MILLIONS' বইতেই নাদিম আমাকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে ওর বাবার সংশ্লিষ্টতার প্রসংগে মেজর রফিকের বর্ননা দেখায়। সেই বর্ননায় আছে, মেজর রফিক মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তেল ও গ্যাস উন্নয়ন সংস্থায় কর্মরত শহীদ কর্নেল কাদির'এর সাথে এক্সপ্লোসিভ এর জন্য যোগাযোগ করেন। কথা প্রসংগে নাদিম আমাকে আরো দেখায়, শহীদ কর্নেল কাদির'কে লিখিত, জেলখানায় নিহত জাতীয় নেতা শহীদ কামরুজ্জামান'এর হাতে লেখা চিঠি! বন্ধু নাদিম এখন বিশিষ্ট সাংবাদিক, নাদিম কাদির।

নাদিম বছরের পর বছর তার বাবার খোঁজ় করেছে। তার বাবার এককালের সহকর্মী, সাবেক আর্মি চিফ জেনারেল আতিক, জেনারেল মাহবুব বা সাবেক মন্ত্রি মেজর রফিক সবার কাছেই গিয়েছে। অনুরোধ করেছে তার বাবাকে খুঁজে বের করতে। কিন্তু কেউ দিতে বা বের করতে পারলনা এই শহীদ কর্নেল কাদির সম্পর্কে কোন সঠিক উত্তর।

নাদিম কিন্তু হাল ছাড়ে নাই। প্রেস ক্লাব, স্টাফ কলেজ বা টি ভি, যেখানেই সুযোগ পেয়েছে বলেছে তার হারিয়ে যাওয়া শহীদ বাবার কথা। কয়েক বছর আগের কথা। নাদিমের কথা শুনে কোন এক ইয়াং আর্মি অফিসার নাদিমের সংগে যোগাযোগ করে জানান যে তিনি এক পেপারে (সম্ভবত), প্রতক্ষদর্শীর বিবরন পরেছেন যে চট্টগ্রাম শহরের এক স্থানে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে বা এপ্রিলের প্রথম দিকে কয়েকজন বাঙ্গালী আর্মি অফিসারকে গুলে করে হত্যা করা হয়। সাংবাদিক নাদিম সেই সূত্র ধরে তার বাবার সমাধিস্থল খুজে বের করে।

ঘটনা চক্রে সেই সময়ই তার বাবার সমাধিস্থল'এ কনস্ট্রাকশান শুরু হওয়ার কথা ছিল। নাদিম সেই সমাধিস্থল সংরক্ষনের জন্য বাংলাদেশ আর্মির সাহায্য কামনা করে। বাংলাদেশ আর্মিতে কর্মরত আমাদের কলেজেরই আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হান্নান'এর ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত কর্নেল কাদিরের সমাধিস্থল সংরক্ষিত করা সম্ভব হয়। আর কিছুদিন দেরী হলেই শহীদ কর্নেল কাদির'এর সমাধিস্থল, রড, সিমেন্ট, ইট, বালু আর সুরকির নীচে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেত!

রাজশাহীতে অবস্থিত ‘কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট’ আর্মি ইঞ্জিনিয়ার্সের শহীদ কর্নেল কাদিরের নামেই নামকরন করা হয় (জেনারেল এরশাদের সময়)। বাংলাদেশে কয়েকটি এয়ারফোর্স এবং নেভী বেইস শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরন করা হলেও, কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট’ই হচ্ছে শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নামে প্রথম এবং একমাত্র ক্যান্টনমেন্ট। এই মহৎ কাজের জন্য জেনারেল এরশাদ অবশ্যই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

উপরের তিনটি ঘটনাই প্রমান করে যে সারা দেশে এভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্য এবং মিসিং লিংক। যা অনেক নিখোঁজ বা শহীদ পরিবারকে দিতে পারে তাদের পরিচিত বা প্রিয়জনের সন্ধান বা অনেক অজানা ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক বিবরন।

বিষন্ন এক ভদ্রলোকঃ নিউ এলিফেন্ট রোডে গুলবাগ মসজিদের পাশেই কাজী ভবন। তার নীচেই ছিল, ‘সেবা ফার্মেসী’। ৬০ এর দশকের শেষ এবং ৭০ এর দশকের প্রথমে এই ‘সেবা ফার্মেসী’ই ছিল নতুন ঢাকার অন্যতম প্রধান ঔষুধের দোকান। আমাদের খুব প্রিয় দোকান ছিল এই ‘সেবা ফার্মেসী’, কারন সব ঔষধ সবচেয়ে সস্তায় পাওয়া যেত এই ফার্মেসীতে। স্বাধীনতার পরের কথা, চশমা পরিহিত এক ভদ্রলোক বসতেন এই দোকানে। খুব চুপচাপ বসে থাকতেন, দরকার না পড়লে একদম কথা বলতেন না! আমাদের সবাইকে হতাশ ও অবাক করে, একদিন এই জনপ্রিয় দোকানটা বন্ধ হয়ে যায়!!

তার প্রায় ২৫ বছর পরের কথা। গ্রীন রোডে আমার এক বন্ধুর বাসায় আড্ডা দিচ্ছিলাম আর টি ভি ‘তে সারা যাকের অভিনীত এক নাটক দেখছিলাম। কথা প্রসংগে আমি বললাম, “জানিস, সারা যাকেরের একমাত্র বড় ভাই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে যাওয়ার পথে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়”! আমি কয়েকদিন আগেই সারা যাকের’এর প্রচারিত সাক্ষাতকার থেকে এই তথ্য পেয়েছিলাম। আমার বন্ধুর স্ত্রী, আমার কথা শুনে আমাদের সাথে যোগ দিলেন এবং বললেন, “ জানেন নাজমুল ভাই, ‘সেবা ফার্মেসী’টা সারা যাকের’এর বাবার ছিল। ভদ্রলোক ছিলেন আর্মির ডাক্তার, রিটায়ার্ড মেজর। একমাত্র ছেলের শোকে তিনি সারাদিন বিষন্নভাবে চুপচাপ ফার্মেসীতে বসে থাকতেন”। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আমার বন্ধুর স্ত্রীর পরিবার, কাজী ভবনের মালিক।

যতদুর মনে পড়ে, সারা যাকেরের বড় ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংরেজী বিভাগের ছাত্র ছিলেন। এই মুক্তিপাগল শিক্ষিত যুবক; শহীদ রুমী, শহীদ লেঃ আশফাকুস সামাদের মতই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কি ঘটেছিল তার জীবনে? চোখে পড়ার মত দেখতে লম্বা ও সুদর্শন, এই রকম জ্বলজ্যান্ত একজন যুবক তো সকলের অগোচরে হারিয়ে যেতে পারেন না? নিশ্চয়ই যুদ্ধে যাবার পথে কেউ না কেউ তাকে দেখেছিলেন, কথা বলেছিলেন তার সাথে। নাদিম যে ভাবে খুঁজে পেয়েছে তার বাবার সমাধিস্থল, ফজলুল হক সাহেব খুঁজে পেয়েছেন তার প্রশ্নের উত্তর, ঠিক একইভাবে সারা যাকের’এর পরিবারের মত আরও হাজার হাজার পরিবার আজও অপেক্ষা করছে তাদের হারানো স্বজনদের জন্য।

যতই দিন যাচ্ছে, প্রাকৃতিক নিয়মেই মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ব্যাক্তি বা প্রতক্ষ্যদর্শীর সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি বা যারা যুদ্ধ দেখেছি, আমি মনে করি আমাদের সবার নৈতিক দ্বায়িত্ব হচ্ছে , আমাদের দেখা সব ঘটনা প্রকাশ এবং প্রচার করা। তা বইয়ের আকারে, খবরের কাগজে, রেডিও বা টি ভি’তে অথবা ইন্টারনেটেই হউক না কেন। এই প্রকাশ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট’ই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম। আর আমরা যারা ইন্টারনেট ব্যাবহার করি তারা

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এই ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য, বিনা খরচে, অতি অল্প আয়েসে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে, পরিচিত বা সংস্লিষ্টদের কাছে পাঠিয়ে আমাদের নৈতিক দ্বায়িত্ব পালন করতে পারি।

আমি জনি না, আমাদের সবার চেষ্টার ফলে অভিনেত্রী সারা যাকের'এর পরিবার তাদের হারানো ভাই'কে খুঁজে পাবেন কি না! তবে আমি নিশ্চিত, আমাদের সবার চেষ্টার ফলে অনেক পরিবারই তাদের নিখোঁজ স্বজন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাবেন। আসুন, সরকার, বা কে কি করল, তা চিন্তা না করে আমরা মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের প্রতি আমদের নূন্যতম নৈতিক দ্বায়িত্বটুকু পালন করি।

*৯ ডিসেম্বর,২০১০ দৈনিক নয়াদিগন্তে প্রকাশিত সুচন্দা ও ববিতার সাক্ষাতকারের পরিপ্রেক্ষিতে 'এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক', গ্রন্থ থেকে মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ) বীরবিক্রম এর সেই কয়েক দিনের বর্ননা সংযোজ়ন করা হয়েছে। আশা করি সেই কয়েকদিনের ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে ভাবে সংশ্লিষ্ট, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ) বীরবিক্রম এর মত সৎ এবং নিরপেক্ষ ব্যাক্তির বিবরনে অনেকের বিভ্রন্তি কেটে যাবে। উল্লেখিত ঘটনার পর, সুচন্দা ততকালীন মেজর মইন, বীর বিক্রম এর সাথে দেখা করেন।

http://www.dailynayadiganta.com/fullnews.asp?News_ID=249211&sec=2

তথ্য সূত্রঃ
১। পূর্বাপর ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনা-গহবর থেকে দেখা, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান (অব)
২। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর, মেজর জেনারেল মুহম্মদ ইব্রাহীম
৩। মুক্তিযুদ্ধ এবং আশুগঞ্জ, অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু
৪। অন্তর্ঘাত ৭১, মানিক চৌধুরী
৫। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্যঃ স্বাধীনতার প্রথম দশক, মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী (অবঃ) বীরবিক্রম

নাজমুল আহসান শেখ, ৯ ডিসেম্বর, ২০১০, সিডনী,
Victory1971@gmail.com